‘ভেটিভার ব্যবহার করে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে বাঁধ রক্ষা করা যেতে পারে যাতে পুরো অবকাঠামো হবে স্থায়ী ও টেকসই’

ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ
(জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং)
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অকাল বন্যা, পাহাড়ি ঢল, বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মানুষের আবাস। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই বেড়েছে এসব দুর্যোগ। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড় আর জলোচ্ছ্বাস বারবার আঘাত হানার কারণে বিনষ্ট হচ্ছে সড়ক অবকাঠামো, বসতবাড়ি, কৃষিজমি। কৃষিজমিসমূহ লবণাক্ততার কারণে দীর্ঘ সময়ের জন্য উর্বরতা হারাচ্ছে। ফলে হ্রাস পাচ্ছে ফসল উৎপাদন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব সরাসরি প্রত্যক্ষ করছে বাংলাদেশের মানুষ। অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ভাঙছে নদীর পাড়, বাঁধ আর রাস্তাঘাট। পাহাড়ধসে বিপর্যস্ত হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জনজীবন।

ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম জাপানের সাইতামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। অসামান্য কৃতিত্বের জন্য ২০১৫ সালে তিনি ‘দ্য কিং অব থাইল্যান্ড ভেটিভার’ পুরস্কারে ভূষিত হন। এ ছাড়া ডক্টর রশিদ স্বর্ণপদক, সারফুদ্দিন স্বর্ণপদকসহ দেশি-বিদেশি বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হন। তাঁর ১০০টির বেশি গবেষণপত্র দেশি-বিদেশি বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিশ্বের গড় তাপমাত্রা দশমিক ৫ থেকে ২ ডিগ্রি বাড়লে বাংলাদেশসংলগ্ন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার। এতে দেশের উপকূলের ১৫ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। মোট ৭৫০ কিলোমিটারের এই উপকূলীয় এলাকা তলিয়ে গেলে এ অঞ্চলের ২ কোটি অধিবাসী জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। তাদের আশঙ্কা, সামনের দিনে ঘন ঘন বন্যা হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বাড়বে, এতে বাড়বে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও। আপৎকালীন মানুষ-গবাদিপশু-জানমাল রক্ষায় অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে নেওয়া হয়নি কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এখনই প্রয়োজন দুর্যোগসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ। বিষয়টি নিয়ে ‘বন্ধন’-এর সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের (জিওটেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম। *বন্ধন*-এর পক্ষে একান্ত এ সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন ***সাইফুল হক মিঠু***

আকিজ সিমেন্ট

নদীভাঙন বাংলাদেশের অন্যতম চিরায়ত সমস্যা হওয়া সত্ত্বেও কেন টেকসই ও স্থায়ী বাঁধ বা ভাঙনরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি?

শুধু নদীভাঙন নয়, এ দেশে বেড়িবাঁধ ভাঙন, রাস্তা ভাঙন কিংবা পাহাড়ধস খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, বাংলাদেশের সর্বত্রই ভাঙনের কারণে ফসলি জমি, বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। গৃহহীন হচ্ছে মানুষ। বিভিন্ন কারণেই নদী, পাহাড় কিংবা রাস্তা ভাঙছে। এখানে কারণসমূহ ভিন্ন হতে পারে, তবে প্রধান সমস্যা হচ্ছে আমাদের দেশের মাটি প্রধানত পাললিক কিংবা পলিমাটি যা বেশ নরম। মাটির এই গঠন ভাঙনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভাঙন হচ্ছে, আবার তার জন্য রক্ষণাবেক্ষণও হচ্ছে। তবুও ভাঙন ঠেকানো যাচ্ছে না। আবার সবখানে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকরও হচ্ছে না। উপযুক্ত সমাধানের অভাবে এমনটা হচ্ছে। অর্থাৎ যেখানে যে সমাধান প্রয়োজন, সেটা ঠিকমতো প্রয়োগ হচ্ছে না। যেটা উত্তরবঙ্গের সমাধান হিসেবে প্রযোজ্য, সেটা দক্ষিণবঙ্গে কার্যকর না হওয়ারই কথা। অথচ আমরা না বুঝে সবখানে চিরাচরিত বা একই রকমের সমাধান প্রয়োগ করছি।

আমাদের এলাকাভেদে সমস্যাটাকে বুঝে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে ভাঙন প্রতিরোধের যে পদ্ধতিগুলো আছে, সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য প্রচুর গবেষণা হওয়া দরকার। প্রচলিত পদ্ধতিতে কী কী সমস্যা আছে, কী হালনাগাদ করতে হবে, তা আমাদের গবেষণা করে বের করতে হবে। বলা যায় মাটির বৈচিত্র্যতা, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং উপযুক্ত সমাধানের অভাবেই স্থায়ী বাঁধ বা ভাঙনরোধী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

নদীভাঙনের পাশাপাশি এ দেশের প্রতিটি নদীই পলি জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে নদীর স্বাভাবিক গতিধারা বজায় রাখা সম্ভব?

নদীতে যে পলি জমে এর প্রধান কারণ আমাদের দেশটি মূলত ডেল্টা বা ব-দ্বীপ। এখানে নদীর বেগ এবং প্রবাহ খুব কম। নদীপ্রবাহ যেহেতু কম, তাই আমাদের পাহাড় থেকে যখন পলি আসে, সেটা নদীতে জমা (সিল্টেশন) হয়ে যায়। এগুলো আমাদের নদীর বৈশিষ্ট্য। এমনিতেই যে অববাহিকা থাকার কথা, সেটাই নেই। মানে যতটুকু এলাকায় পানি প্রবাহিত হওয়ার কথা, সেটাই নেই। সে জন্য নদী দ্রুত ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীর নাব্যতা রক্ষায় ব্যাপকভাবে খনন (ড্রেজিং) করতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নদী দখল, যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। নদী দখল করে যেসব স্থাপনা বানানো হয়েছে, সেগুলো সরাতে হবে। কারণ, নদীর একটা নির্দিষ্ট গতিপথ আছে। নদীর গতিপথ বন্ধ করে দিলে নদী

আকিজ সিমেন্ট

ভাঙন কবলিত বাঁধ

নদীভাঙন রোধে দীর্ঘ মেয়াদে টিকতে পারছে না জিওটেক্সটাইল ব্যাগ

তার নাব্যতা হারায়। শুধু ড্রেজিং করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

নদীভাঙন রোধে অস্থায়ী বাঁধ হিসেবে বালির বস্তা আর স্থায়ী হিসেবে সিসি ব্লক ও জিওটেক্সটাইল ব্যাগ স্থাপন করা হয়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা টিকতে পারছে না। টেকসই বাঁধ নির্মাণে ভেটিভার কতটা কার্যকরী? অন্য আর কী কী পদ্ধতি রয়েছে?

সিসি (কংক্রিট) ব্লক কিংবা জিওটেক্সটাইল ব্যাগ স্থাপনা করা বহুল প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু এতে প্রচুর খরচ হয়। সিসি ব্লক কিংবা জিওটেক্সটাইল যদি ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয়, ডিজাইন বা পরিকল্পনা যদি সঠিক থাকে, নির্মাণপদ্ধতিতে এবং রক্ষণাবেক্ষণে যদি কোনো ভুল না থাকে, তাহলে এই অস্থায়ী বাঁধগুলো দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার কথা। তবে বিবিধ কারণে বাঁধগুলো দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। কোনো কোনো স্থানে যতটুকু এলাকাজুড়ে সিসি ব্লক দেওয়া দরকার, ততটুকুও দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, এ ধরনের ব্লক অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সে ক্ষেত্রে আমাদের এমন সমাধান পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে, যেটা সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব এবং যেন পুরো এলাকায় সরবরাহ করা যায়। কারণ, পুরো এলাকা যদি রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয়, তাহলে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা যাবে না।

অন্যদিকে ভেটিভার (বিন্না ঘাস) বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং মেথড (জৈব প্রকৌশল পদ্ধতি) হিসেবে খ্যাত। এটা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের এবং কার্যকর। যেখানে প্রযোজ্য সেখানে ভেটিভার ব্যবহার করে বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতিতে বাঁধ রক্ষা করা যেতে পারে যাতে পুরো অবকাঠামো হবে স্থায়ী ও টেকসই। ফলে খরচ কমায় যা হবে পরিবেশবান্ধব। আমাদের যা সম্পদ আছে, তা যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নদীভাঙন, রাস্তা ভাঙন ও পাহাড়ধসের সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে পারি।

বুয়েট তথা আপনাদের তরফ থেকে বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভেটিভার ও জুট জিওটেক্সটাইল ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এটা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে? কোথাও কি এর ব্যবহার হচ্ছে?

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানভেদে ভেটিভার ও জুট জিওটেক্সটাইল ব্যবহার করা হচ্ছে। গ্রামীণ রাস্তা, নদীর ভাঙন রোধে ভেটিভার ও জুট জিওটেক্সটাইল অত্যন্ত কার্যকর। এগুলো ব্যবহার করলে পরিবেশের ক্ষতি হয় না। চর রক্ষা, রাস্তাঘাট, পাহাড়ধস রোধে ভেটিভার অনেক কার্যকর যা ইতিমধ্যে প্রমাণিত। আমরা বর্তমানে এলজিইডি, বিভিন্ন দাতা সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন প্রকল্প করেছি ভেটিভারের ব্যবহার নিয়ে। চট্টগ্রামসহ বেশ কিছু এলাকায় ভেটিভার ব্যবহার করে সুফল

আকিজ সিমেন্ট

পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কক্সবাজারে রোহিঙ্গা রিফিউজি ক্যাম্পের পাহাড় রক্ষায়ও ভেটিভার ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার ও থাইল্যান্ডের যৌথ সহযোগিতায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নগরীর টাইগারপাস মোড়ে 'ভেটিভার প্রদর্শনী কেন্দ্র' স্থাপন করেছে। ৩০ মে, ২০১৯ তারিখে থাই রাজকন্যা মাহা চাকরি সিরিনধরন ভেটিভার প্রদর্শনী কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন। আমি সেখানে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছি। জুট জিওটেক্সটাইলের ব্যবহারও ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। আমাদের মাটিতে প্রচুর বালি। তাই বালি দিয়ে তৈরি বাঁধও ক্ষণস্থায়ী। যেহেতু ভেটিভার বালিতে ভালো জন্মায়, তাই বাঁধ রক্ষায় ভেটিভার অনেক কার্যকর। উন্নত অনেক দেশও এখন ভেটিভার ব্যবহার করছে।

কুয়াকাটা, শাহ পরীর দ্বীপসহ বিভিন্ন সমুদ্র উপকূলও ভাঙনের শিকার। এ ক্ষেত্রে নদী ও সমুদ্রের বাঁধ ডিজাইনের মৌলিক পার্থক্যসমূহ কী কী?

সমুদ্রের পাড় আর নদীর পাড় এক জিনিস নয়। সমুদ্রের ঢেউ, প্রবাহ, বেগ নদীর মতো না। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হলো, সমুদ্রে ঢেউ আছে। সমুদ্র এলাকায় বাঁধ রক্ষা অনেক ব্যয়বহুল ও জটিল। বড় বড় কংক্রিট ব্লক ফেলে বা অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে সমুদ্রের বাঁধ রক্ষা করা যায়।

উপকূলীয় এলাকায় টেকসই সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলতেই-বা করণীয় কী?

আমাদের সর্বত্রই রাস্তার সমস্যা। কোথাও রাস্তা বসে যায়, কোথাও ভেঙে যায়। এ জন্য যথার্থভাবে বাঁধ তৈরি করতে হবে। যেখানে মাটির সমস্যা, সেখানে 'গ্রাউন্ড ইম্প্রুভমেন্ট' করতে হবে। রাস্তায় যতটুকু ঢাল থাকার দরকার, ততটুকু নেই; রাস্তার শোল্ডার নেই। যেখানে ঢাল থাকার দরকার ১:৩, সেখানে আছে অনেক কম। সে ক্ষেত্রে রাস্তা টিকে থাকে না। তাই অবশ্যই উপযুক্ত ডিজাইন করতে হবে।

প্রতিবছর পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটছে, হতাহত হচ্ছে অনেকেই। পাহাড়ধস মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে কিছু বলুন?

পাহাড়ধস মূলত দুই কারণে হয়। একটা হয় আমাদের মাটির ধরনের কারণে। এমনিতেই আমাদের মাটি অত্যন্ত নরম। আরেকটা হচ্ছে ব্যাপকভাবে পাহাড় কাটায়, ফলে পাহাড়ের নিচে কাটায় পাহাড়ের মূল কাঠামো নষ্ট হচ্ছে। কাঠামো নষ্ট করলে পাহাড় তো ধসে পড়বেই। এটা বন্ধ করতে হলে পাহাড় কাটা বন্ধ করতে হবে। পাহাড়ের ওপর অবৈধ বসতি উচ্ছেদ করতে হবে। পাহাড়কে তার স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে দিলে এবং যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা নিলে ধস অনেকাংশে কমে যাবে।

রিফিউজি ক্যাম্প, কক্সবাজার

ভেটিভার রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম

উপকূলীয় এলাকায় ভেটিভার দিয়ে রাস্তা সংরক্ষণ

হাওরাঞ্চলে ভেটিভার দিয়ে নদীর পাড় রক্ষা

আকিজ সিমেন্ট

বুয়েটে গবেষণার জন্য ভেটিভার মডেল

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগসহনীয় আবাসনব্যবস্থা এখনো গড়ে ওঠেনি। এসব এলাকায় উপযোগী আবাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলুন?

মূলত যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে সমন্বিত আবাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। যেখানে যা দরকার, সেখানে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয় না। যেমন উপকূলীয় এলাকা, পাহাড়, চর কিংবা হাওর এলাকার আবাসানব্যবস্থা কিন্তু ভিন্নতর হবে। স্থানীয় পণ্য ব্যবহার করে আবাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের পরামর্শ অবশ্যই নিতে হবে। কেননা তারা তাদের এলাকা সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত। স্থানীয় দক্ষতা বা লোকবল, সংস্কৃতি, দুর্যোগসহনীয়তা সব বুঝে আবাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এ দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, যাদের অধিকাংশই দরিদ্র। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিতে করণীয় কী?

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামীণ অবকাঠামোর পরিবর্তন হচ্ছে। কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই একের পর এক ভবন গড়ে উঠছে। গ্রামে ভবন বা বিল্ডিং হচ্ছে একের পর এক। মাটির ঘর, চালের ঘর হারিয়ে যাচ্ছে। অনুকরণ করে বিল্ডিং বানানোর প্রতিযোগিতায় নামছে সবাই। কিন্তু আসলে ওই এলাকার মাটি, পরিবেশের জন্য কোনটা ভালো, সেটা গ্রামের মানুষকে বোঝাতে হবে। নগরকেন্দ্রিক, অপরিকল্পিত বাড়িঘর করে গ্রামের পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে গ্রামের মানুষের স্থানীয় কাঁচামাল বা পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে।

আকিজ সিমেন্ট

বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়ার একটি সড়ক রক্ষায় রোপিত ভেটিভার

স্বল্পমূল্যের টেকসই আবাসনব্যবস্থা, নির্মাণকৌশল ও বিকল্প নির্মাণ উপকরণ সম্পর্কে আপনার গবেষণার আলোকে কিছু বলুন?

এ নিয়ে আমার কিছু গবেষণা আছে। যাঁরা মূলত গ্রামের মানুষ, তাঁদের কী চাহিদা আছে, সেটা মাথায় নিয়ে দুর্যোগসহনশীল করে, স্থানীয় কাঁচামাল যেমন মাটি, বাঁশ ব্যবহার করে, কম খরচের বিষয়টি মাথায় নিয়ে স্বল্পমূল্যে আবাসন নির্মাণে মনোযোগী হতে হবে।

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় এবং পাঠ্যপুস্তকে দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার উপায় বিষয়গুলো কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে?

একসময় এসব বিষয় নিয়ে খুব বেশি লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। তবে এখন বিভিন্ন শ্রেণিতে সমাজ, পরিবেশ পরিচিতি বইয়ে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। এখন পরিবেশবিজ্ঞান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ও পড়ানো হচ্ছে এবং আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কী ধরনের সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

আমরা যে প্রযুক্তি, যে পদ্ধতি নির্বাচন করব, সবকিছু যেন পরিবেশবান্ধব হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রচুর বনায়ন যেমন করতে হবে, তেমনি বন রক্ষার পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থানীয় পণ্য ও স্থানীয় মানুষের মতামতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। কার্বন নির্গমন কমাতে হবে, পণ্যের পুনর্ব্যবহার বাড়াতে হবে। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। সর্বোপরি সবাইকে বৈশ্বিক পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

আপনাকে ধন্যবাদ, স্যার।

আপনাকেও ধন্যবাদ।

আকিজ সিমেন্ট

উপকূলীয় এলাকায় চিংড়ি ঘেরের পানি আটকাতে দেওয়া বাঁধ